থিয়েটারের খোঁজে

বাদল সরকার

এক নয় বহু, সমগ্র নয় খণ্ড। একের মধ্যে কী করে এই 'বহু'-কে ধরা যায়। এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত আপাত বিচ্ছিন্ন সব অভিজ্ঞতার পারম্পর্য রক্ষাও প্রায় অসম্ভবেরই নামান্তর। সহজ, স্বাভাবিক পথে এ ধরনের সুসংগতি অর্জন করা যাবে না। তখন ভাবতে বাধ্য হই—কী দরকার আরোপিত সংগতির? বরং থাক না ভাঙাচোরা ছবি, টুকরো-টাকরা, ফাঁক-ফোকর। যা সহজ, স্বাভাবিক।

আর এই লেখকমশাই, আমি নিজেই কি সম্পূর্ণ! সমগ্র নই, সম্পূর্ণ নই। কত কী মিশে আছে আমার মধ্যে, কত-শত উপাদানে গড়া এই আমি। সেই শত-উপাদানের ধর্মও এক নয়। রীতিমতো লড়াই আছে পরস্পরের সঙ্গে। যুদ্ধ চলছে অবিরত। আমি যেখানে আছি সেই পৃথিবী-ও তো এক, অখণ্ড নয়। টুকরো-টুকরো। খণ্ডিত পৃথিবী। চতুর্দিকে দ্বন্দ্ব। কোলাহল মুখর।

এমন এক উদ্ভট দুনিয়ায় সংগতির খোঁজ করাটাই প্যাগলামি।

জন্মেছি, বেড়ে উঠেছি শহর কলকাতায়। বিদেশি শাসকের হাতে গড়া, তাদের স্বার্থ-পূরণে ব্যবহৃত এক শহর। আজও এ শহর বেঁচে আছে তার বিশাল পশ্চাদভূমি গ্রামাঞ্চল শুষে। ভারতে এরকম বড়-বড় শহর আরও আছে। কিন্তু এখানে ভারত কোথায়? অথচ গোটা দেশটাকে, ভারতকে শাসন করছে এই গুটিকয় শহর। আশ্চর্য উলটপুরাণ।

এই যেমন আমরা বিশ্বাস করি মানুষের মৌলিক অধিকারে। কতরকম অধিকার! স্বাধীনতার-কাজের-আহার্যের-বস্ত্রের-বাসস্থানের-স্বাস্থ্যের এমনকি সংস্কৃতিরও। একই সঙ্গে এই আমরাই আবার বিশ্বাস করি দুর্লঙ্ঘ্য, সম্পত্তির মানবিক অধিকারেও। শেষের এই অধিকারটির এক আঁচড়েই দেশের আশিভাগ মানুষের সমস্ত অধিকার নস্যাৎ হয়ে যায়। নারী-পুরুষের সমতায় আমরা বিশ্বাস করি, অথচ স্ত্রী কর্মরতা হলেও ঘর-গেরস্থালিসহ স্বামী-পুত্র-কন্যার সমস্ত ঝক্কি তাকেই সামলাতে হবে। আরও আছে, যেমন সমস্ত মানুষ সমান একথা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও আমাদের ঘরের মেয়ে ভিন্ন ধর্মের, মতের কাউকে বিয়ে করতে চাইলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে এতসব বিরোধ, কই আমাদের নজরে তো কিছুই পড়ে না। একরকম ভুলেই থাকি।

চাঁদে মানুষের পা পড়লে গভীরভাবে মুগ্ধ হই। মানুষের সৃষ্ট যন্ত্র সৌরজগতের প্রায় শেষ প্রান্ত থেকে ছবি পাঠালে উল্লসিত হই। এবার অন্য একটি চিত্র : প্রতি চার সেকেন্ডে এই গ্রহে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা—১। মানুষ এতটাই নির্বোধ যে অনাহারজনিত এই মৃত্যুকে সে ঠেকাতে পারছে না। এই সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা সে অর্জন করেনি। মানুষের এহেন নির্বুদ্ধিতাকে আমরা প্রশ্ন করি না। যুদ্ধের বিভীষিকার কথা আমরা জানি। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আমাদের বড় কম নয়। অথচ প্রতিবার যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠা মাত্র আমরা উত্তেজিত হই। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে কোনও কণ্ঠস্বর উঠলে, যে কেউ এই নিয়ে প্রশ্ন তুললে আমরা তাকে বিশ্বাসঘাতক, দেশের শত্রু বলে ছাপ মেরে দিই। কই, এসব বৈপরীত্যের কথা আমরা তো ভেবেও দেখি না।

শিল্পের সৌন্দর্য ও তার পবিত্রতা নিয়ে কত কিছু লিখি, কত কথা বলে চলি। যদিও শিল্প নিয়ে আমাদের যাবতীয় কারবার পণ্যের যুক্তিতেই সারি। জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন খাবার-পোশাক-আশ্রয়-শিক্ষা ইত্যাদির মতোই শিল্পকেও বাজারে এনে ফেলা হয় বেচাকেনার জন্য।

আসলে ধরেই নিয়েছি এইসব বিদঘুটে সমস্যার কোনও সমাধান আমরা করতে পারব না। এদের নিয়েই আমাদের চলতে হবে। বাঁচতে শিখেছি সেভাবেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হল আমাদের মধ্যেই কেউ যদি এ জাতীয় কোনও একটি সমস্যার সমাধানের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন তখন আমরাই তাঁকে 'পাগল' আখ্যা দিই। প্রাণান্তকর চেষ্টা, তাঁর সততা, আন্তরিকতা আমাদের আসামির কাঠগোড়ায় তুলতে পারে। তাঁকে চেষ্টা করতে দেখলেই নিজেদের অপরাধী মনে হয়। তখন আর আমরা নিরীহ নিষ্ক্রিয় থাকি না। নিন্দা-মন্দ-কুৎসা তো আছেই, শেষে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠি। যেন পারলে তাকে খুন করি।

কথাগুলো হয়ত এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আসলে এখন আমি এরকম এক সমাধান প্রয়াসের কথাই বলতে চাই। যা শুরু হয়েছিল বছর কুড়ি আগে, সত্তরের গোড়ায়। গুটিকয়েক মানুষ দৃঢ় চিত্তে শুরু করেছিল এক অভিযান। সঙ্কল্প একটাই, অন্তত একটি ক্ষেত্রে যদি দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ হওয়া যায়। অর্থাৎ সেই গুটিকয়েক মানুষ হয়ে পড়লেন উন্মাদদের ছোট্ট একটি দল। যে ব্যবস্থায় মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস শুধু টাকার বিনিময়েই পাওয়া সম্ভব সেখানে তারা চেষ্টা করল থিয়েটারের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প-মাধ্যমকে সর্বসাধারণের জন্য অবাধ উন্মুক্ত করে দিতে। ঘটনাচক্রে আমি সেই তাদেরই একজন এবং আজও তাই আছি।

এই কি সব? ঠিক এভাবেই কি শুরু হয়েছিল সেই অভিযান? যেন হাতে ধরা আছে একটি সুবিন্যস্ত মানচিত্র, লক্ষ্য 'মুক্ত থিয়েটার'-এর বন্দর। না, ঠিক এরকমটা ছিল না। এই অভিযানটির আগে ছিল আরও-আরও অভিযান। নিছক ভুল পথে যাত্রারম্ভ নয়, আমাদের থিয়েটারের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল অভিযানের পর অভিযান। আমাদের জীবনেও এজাতীয় অভিযানের গুরুত্ব অপরিসীম।

থিয়েটার আর জীবন—এদের কি পৃথক করা সম্ভব? শুরুতে হয়ত তাই ছিল কিন্তু পরে? এখন?

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস। মাত্র ১১ ফুট চওড়া মঞ্চ কিন্তু সেই প্রেক্ষাগৃহে ৬০০ জনের বসার ব্যবস্থা আছে। ঠিক এক বছর আগে 'শতাব্দী' নামে একটি নাটকের দলের জন্ম হয়েছে। তাঁরা কাজ করতে চাইছেন বেশ বড় মাপেই। নতুন এক অভিযানের সূচনা। শুরুতে ধরা হল একটা কমেডি। তারপর দুটি ছোট নাটক। মোটামুটি সাড়া মিলল। দলে নানান সমস্যা। ব্যাস-'শতাব্দী' খতম। থিয়েটারও শেষ, অন্তত আমার দিক থেকে। শেষ হল এই যাত্রাটিও।

ফিরে যাওয়া যাক ১৯৪১ সালের বেশ কিছু আগে। দুটো চৌকি জুড়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। ১৬ ফুট বাই ১১ ফুট একটি বৈঠকখানার দুই- তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে। বিছানার চাদর, শাড়ি, ধুতি দিয়ে পর্দা-ব্যাক ড্রপ, উইংস তৈরি হল। বাবা-কাকা-মামা—দাদু-দিদিমা এঁদের নিয়ে ১৫ জনের এক দর্শকমণ্ডলী। ভাইবোন, মাসতুতো, খুড়তুতো ভাইবোন আর কিছু বন্ধু-বান্ধব নাটকের পাত্র-পাত্রী। ১৫ বছর ৭ মাস বয়সের এক কিশোরের থিয়েটার অভিযান শুরু হয়েছিল এইভাবে নির্দেশক, নাট্যকার এবং প্রধান অভিনেতা হিসাবে। একটি ইংরেজি নাটক অবলম্বনে নাটকটি রচিত হয়েছিল। সেই একই যাত্রার পুনরাবৃত্তি ঘটল ২ বছর পরে ১৯৪৩-এ। সেই একই ঘর, দর্শক এবং পাত্র-পাত্রীও এক। এবার অবশ্য নাটকটি রচিত হয়েছিল একটি বাংলা ছোট গল্প অনুসরণে। তারপর বহু বছর নানা পথ পরিক্রমা। থিয়েটারের সঙ্গে তার কোনওই সম্পর্ক নেই। না, খুব ঠিক কথা বলা হল না। প্রবল উৎসাহে নাটক পড়ছি—ছাত্রদের করা নাটক দেখছি—কাজেই সেও নাটকেরই দীর্ঘ যাত্রার অন্তর্গত। শুদ্ধু থিয়েটার করার কোনও চেষ্টা ছিল না! থিয়েটার করার প্রতি আমার যে একটা নাড়ির টান আছে সে কথা কখনও ভাবিনি। তা ছাড়া আর পাঁচটা কাজের দাবি মেটাতেই ফুরিয়ে যেত আমার সমস্ত অবসর। সেই বছরগুলো ছিল: পড়াশুনো, স্বাধীনতা-সংগ্রাম, পরীক্ষা, রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ, বি. এ. পাশ করা, উদ্বাস্তু-শিবির, দিনের বেলায় চাকরি, সন্ধেবেলায় কলেজে ক্লাস, বিয়ে, বাবা হওয়া। কত মহান স্বপ্নই না দেখেছি তখন। তারপরই চূড়ান্ত স্বপ্নভঙ্গ আর হতাশা। এই শতকের চারটি দশক শেষ হল—শুরু হল পঞ্চম দশক। দিগন্তপ্লাবী এক শূন্যতা দূর করতে গোপনে হামাগুড়ি দিয়ে তখন এগিয়ে আসছে থিয়েটার।

১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি। 'শতাব্দী'-র একদল তরুণ সদস্য দলের মৃত্যু মেনে নিতে রাজি নয়। আমি থিয়েটার ছেড়ে দিই তাও তারা চায় না। শুরু হল থিয়েটার সংক্রান্ত এক পাঠচক্র। দফায়-দফায় বসলাম আমরা। বেশ কয়েকবার রিহার্সাল দিলাম একটি নাটকের। যদিও মাথায় স্পষ্টভাবেই গাঁথা ছিল যে এই নাটকটিকে কখনওই মঞ্চস্থ করা যাবে না। ১৫ বছর আগের কথা ১৯৫৩ সাল। মাইথনে দামোদর ভ্যালি

কর্পোরেশনের কনস্ট্রাকশন ক্যাম্পে আছি। একদল তরুণ ইঞ্জিনিয়ার আর তাদের বউরা একটি কোয়ার্টারে রোজ জড়ো হতো। নানা নাটকের মহড়া দিত তারা। কাকে কোন ভূমিকায় মানাচ্ছে—কার কেমন যোগ্যতা এসব বিচার না করে এলোমেলো-ভাবে চরিত্র বেছে নিত। এ ব্যাপারে তাদের একটিমাত্র নিয়মের সংবিধান ছিল। সেটাই যা বাঁচোয়া। ওই নিয়মে বলা হয়েছিল : এটা একটা রিহার্সাল ক্লাব এবং আমরা কখনওই কোনও নাটক মঞ্চস্থ করব না।

কিন্তু শেষপর্যন্ত সংবিধান লঙ্ঘন করে মাইথনে ১৯৫৩ সালে একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হল। ঠিক যেমন ১৯৬৯ সালে 'শতাব্দী' করেছিল। মাইথনে ১৯৫৩ সালে নাটকটি মঞ্চস্থ করার পর ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই প্রথম নারী চরিত্রে অভিনয় করল মেয়েরাই। অভিনেতারা ঘড়ির কাঁটা মেনে কাজ শুরু করল। ফলে, অনেকেই পুরো নাটকের বেশ খানিকটাই দেখতে পায়নি অভিনেতারা প্রত্যেকে-মনোযোগ দিয়ে তাদের পার্ট মুখস্থ করায় প্রম্পটিং-এর কোনও দরকার হয়নি। বহু সন্ধ্যার মহড়ার ফলেই এটা সম্ভব হয়। ১৯৬৯ সালে 'শতাব্দী'-র নাটক কিন্তু কলকাতাকে কাঁপাতে পারেনি। সাড়া ফেলতে পারেনি কলকাতার কোনও পাড়াতেও। তবে এক নতুন যাত্রা অবশ্যই শুরু হয়েছিল। 'শতাব্দী'-র পুনর্জন্ম হল।

'শতাব্দী' "মিছিল" নাটকটি করছে আসানসোলের এক খোলা মাঠে। নাগরিক অধিকার রক্ষা সমিতির সমাবেশে। এই নাটকে এক যুবক প্রতিদিন নিহত হয় এবং কেউ তার দিকে তাকিয়েও দেখে না। অধিকারহীন মানুষের এই দেশে নাগরিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত উন্মাদ মানুষজনের সঙ্গে ওই যুবকের কিছু সম্পর্ক আছে, তারা তাকে দেখে। নাটকের শেষে আমরা শব্দহীন একটি গান গাই—দর্শকদের বলি আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। অধিকাংশ দর্শকই এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল। এ ছিল "মিছিল"-এর ১৯৯-তম অভিনয়—ছেদহীন এক যাত্রা যা শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালের ১৩ এপ্রিল রামচন্দ্রপুর গ্রামে। তদাবধি মুক্ত থিয়েটার হয়ে ওঠে এক নিশ্চয়তা। সে আর নিছক সম্ভাবনা নয়। কিন্তু ১৯৬৯ সালে পুনর্জন্মের পর 'শতাব্দী' যখন যাত্রা শুরু করল তখন মুক্ত থিয়েটারের কথা আমাদের প্রায় কল্পনাতেও ছিল না। আমাদের মতোই আর যাঁরা থিয়েটারের কাজ করছিলেন সেই তাঁদের মতোই আমরাও বিশ্বাস করতাম না মুক্ত থিয়েটার বলে কিছু সম্ভব। শহুরে থিয়েটারকেই মেনে নিয়েছিলাম—প্রসেনিয়াম স্টেজ, আর প্রেক্ষাগৃহ, থিয়েটারের সেট, স্পটলাইট ইত্যাদি। সংক্ষেপে, একশতকেরও আগে ব্রিটেন থেকে আমদানি করা থিয়েটার। প্রকারান্তরে আমরা এটাও মেনে নিয়েছিলাম যে থিয়েটার করতে টাকা লাগে। তবে পাগলের মতো চেষ্টা করেছি প্রোডাকশনের খরচ কমাতে। এ ব্যাপারে আমরা একটা নীতি নির্ধারণ করি, সেট-প্রপ এবং কস্টিউম সব মিলিয়ে প্রোডাকশনের খরচ কিছুতেই একশ টাকার বেশি করব না। একবার সেট হিসাবে যে সব জিনিস ব্যবহার করেছি সেগুলোকে ফেলে দিতাম না। বরং চেষ্টা করতাম পরবর্তী নাটকেও কাজে লাগাতে "বল্লভপুরের

রূপকথা" নাটকটির সেট বাবদ খরচ হয়েছিল মাত্র ৬৫ টাকা। সিংহাসন, স্তম্ভ ইত্যাদি-সহ একটি জীর্ণ প্রাসাদের সভাঘর তৈরি ওই টাকাতেই। "আবুহোসেন" নাটকের ক্ষেত্রে সেট হিসাবে দরকার ছিল সভাঘর, বাগান, রাস্তা ইত্যাদি। এই সবে লাগে একশ টাকারও কম। আসলে আমরা শিখে ফেলেছিলাম আমাদের এবং দর্শকের কল্পনাকে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু মুক্ত থিয়েটারের কথা ভেবে যে এসব করেছি তা কিন্তু নয়। থিয়েটারের দল হিসাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বাধ্য হয়েই এসব করতে হয়েছিল।

সত্যি টিকে থাকা যে কী কঠিন! শুনেছি বৃহত্তর কলকাতায় নাকি পাঁচ থেকে ছ-হাজার থিয়েটারের দল আছে—আমি কিন্তু একথা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। শিশু মৃত্যুর হার খুব চড়া কিন্তু জন্মহারও সেইরকম বেশি। প্রতিমুহূর্তে টিকে থাকার জন্য কত গ্রুপই না সংগ্রাম করে চলেছে। থিয়েটার-হল ভাড়া করো, হিসাব করে কাগজে নামমাত্র বিজ্ঞাপন দাও, পোস্টার বা ইশতেহার দিয়ে বিজ্ঞাপন করো—এর উপর আছে সেট, প্রপ, কস্টিউম এবং লাইট বাবদ খরচ। আর হাড়েহাড়ে জানি কলকাতায় নাটক করে এই খরচ আদৌ তোলা যাবে না। তখন শুরু হয় এক অপেক্ষা কখন সংবাদপত্র ও পত্রিকায় একটু প্রশংসামূলক সমালোচনা বের হয়। যাতে 'কল-শো' জোটানো সহজ হবে। 'কল-শো' বলতে কলকাতার থিয়েটারের লোকেরা বোঝায় আমন্ত্রিত অভিনয়। শহরে নাটক মঞ্চস্থ করে গ্রুপের যে আর্থিক ক্ষতি হল, আমন্ত্রিত অভিনয় থেকে তা পুষিয়ে নেওয়ার এক চেষ্টা, যাতে তারা পরবর্তী নাটক করতে পারে। আর 'কল-শো' না পেলে? তখন কাজ করে শিশু মৃত্যুর সূত্র। যদি কিছু আমন্ত্রণ পাওয়া যায় তাহলে শিশুটি বড় জোর একটু ডাগর হয়ে উঠতে পারে।

দলের কাজ কলকাতা লুফে নিলে, কলকাতায় স্বীকৃতি পেলেই শুধু বোঝা যাবে—হ্যাঁ, দলটি এখন সাফল্য অর্জন করেছে। 'কল-শো' থেকে পাওয়া টাকাটা উদ্বৃত্ত অর্থ। যাইহোক আমাদের থিয়েটার গ্রুপ 'শতাব্দী' শুরু থেকে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ও ২টি ছোট নাটক নিয়ে কাজ করেছে। প্রয়োজনার খরচ কমিয়েছি উত্তরোত্তর। নাটকের প্রস্তুতিপর্বে হৃদ্দমদ্দ খেটেছি। টিকিট কেনার জন্য বন্ধুদের ঝোলাঝুলি করেছি। এইরকম চলেছে যতদিন পর্যন্ত না সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেছি অর্থাৎ শহরে নাটক করাটা আর্থিক-ভাবে স্বনির্ভর হয়েছে। এই অবস্থায় আমরা পৌঁছই শেষ তিনটি নাটকের উপস্থাপনার সময়—"সাগিনা মাহাতো", "বল্লভপুরের রূপকথা" এবং "আবুহোসেন" বিশেষকরে শেষেরটিতে। দেদার টাকা হয়ে গেল। আমাদের সম্পত্তির পরিমাণ সহস্রের অঙ্কে চলে এল।

কিন্তু সহস্রের অঙ্কে কোনওমতে পৌঁছলেই টিকে থাকার গ্যারান্টি মেলে না। তো, একদিকে টিকে থাকার এই পাঁচ বছরের সংগ্রাম আর তার আগের প্রায় পনেরো বছর যাবত থিয়েটার নিয়ে বিচ্ছিন্ন বহু অভিজ্ঞতা—ইত্যাদি থেকে আমার মনে বেশ কটি প্রশ্নের উদয় হল। তারমধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল: থিয়েটারে না গিয়ে

লোকে কেন ফিল্ম দেখতে যেতে চায়? সৌভাগ্যের কথা তখন ভারতবর্ষে টিভি ছিল না। তবে থাকলেও তাতে এই প্রশ্নের হেরফের হতো না।
এর আশু ও সহজ উত্তর হল থিয়েটারের থেকে ফিল্ম অনেক বেশি কিছু দেখাতে পারে। আর দর্শকেরও টিকিটের দাম অনেক বেশি উশুল হয়। তবে এটা নিশ্চয়ই সব প্রশ্নের উত্তর নয়, সত্যিকারের তো নয়ই। থিয়েটার কী করে আড়াই হাজার বছর টিকে আছে? আর কেনই বা টেলিভিশন ফিল্মকে খতম করে আনলেও থিয়েটারকে আজও শেষ করতে পারেনি। তার মানে একটি বিশিষ্ট শিল্প-মাধ্যম হিসাবে থিয়েটারের নিশ্চয়ই কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ফিল্ম বা টেলিভিশনের তা নেই এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি নকল করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে সর্বপ্রধানটি অতীব স্পষ্ট। যদিও শহুরে থিয়েটারের লোকজনের হয় তা নজরেই পড়ে না কিংবা জেনেশুনেই তাকে অগ্রাহ্য করে। থিয়েটার এক জীবন্ত শিল্প, যেখানে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ আছে। থিয়েটার বলতে বোঝায়—'এখন', 'এখানে' এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে দু-দল মানুষ একই দিনে, একই সময় একই স্থানে উপস্থিত। থিয়েটার নামক ঘটনাটি তা ছাড়া ঘটবেই না।
তবে এসব গপপো এখন পুরনো হয়ে গেছে, এ নিয়ে আমি আগে অনেক লিখেছি, বলেওছি। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এই সরাসরি সংযোগকে আরও গভীর করতে দু-দল মানুষের ব্যবধান কী করে কমানো যায় তা নিয়ে বেশ কিছু থিয়েটার-দল কাজ করে চলেছে। থিয়েটারের এই মূল শক্তিকে তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অভিনেতা আর দর্শক এই দুয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় পাঁচিল আলো আর আঁধার (প্রসেনিয়াম থিয়েটারের ক্ষেত্রে)। এখানে অভিনেতা দর্শককে অন্ধকারে ডুবিয়ে যেন তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছে। বিশদে যাওয়ার দরকার নেই। প্রসেনিয়াম স্টেজ থেকে নেমে এসে দর্শকের সঙ্গে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়া থিয়েটার-স্থান সম্পর্কে কথা বলা যাক। এ এমন এক থিয়েটার-পরিস্থিতি যেখানে দর্শককে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়নি তাকে এক অলস গ্রাহকে পরিণত করা হয়নি। থিয়েটারের অভিজ্ঞতা এখানে দু-দল মানুষ সমানভাবে ভাগ করে নিচ্ছে এবং তারা তাতে রীতিমতো অংশ নিচ্ছে।
ন্যাচারালিস্ট থিয়েটারের দাবি, 'বাস্তবের মোহ' সৃষ্টি করতে হবে। মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর আমরা উপলব্ধি করলাম এর কোনও প্রয়োজন নেই। কার্যত আমরা যখন প্রসেনিয়াম স্টেজে কাজ করেছি কিংবা স্টেজ মাথায় রেখে লিখেছি তখনও ন্যাচারালিস্ট থিয়েটার আমাদের তেমন উপকারে আসেনি। স্থানকালের বিচারে, থিয়েটারের সমগ্রতার বিচারে ন্যাচারালিস্ট থিয়েটার নেহাতই সামান্য একটা অংশ। তার বয়সই বা কত? দু-শতকেরও কম। সারা বিশ্বের থিয়েটারের মানচিত্রে জনসাধারণের খুব সামান্যতম একটা অংশই এই থিয়েটার দেখেন বা চর্চা করেন। নিজেদের দেশের পরিস্থিতির কথা ভাবা যাক। আমাদের ঐতিহ্যবাহী ও লোকনাট্যের একটিও ওই ঘরানার নয়, অর্থাৎ ন্যাচারালিস্ট নয়। একবার ভাবুন তো কত অসংখ্য লোক ঐতিহ্যবাহী এইসব নাটক এবং লোকনাটক দেখে।

অন্যদিকে আমরা যদি থিয়েটারের ওই সামান্য (যদিও গুরুত্বপূর্ণ) অংশ বাদ দিই তাহলে শুধু যে সরাসরি সংযোগের শক্তিকে ব্যবহার করতে পারব তাই নয়, যে জিনিসটাকে আমরা অন্তত মহান মনে করি তার ভিতও গড়ে তুলতে পারব : তা হল 'ফ্রি থিয়েটার'। ইংরেজি 'ফ্রি' শব্দটির দুটি অর্থ আছে, যার একটি হল মাগনা মানে যা বিনে পয়সায় পাচ্ছি। দ্বিতীয় মানেটি অনেক বেশি ব্যাপক, এর দ্বারা বোঝায়, কোথাও কোনও বন্ধন নেই, নির্ভরতা নেই।

আমাদের থিয়েটারের ক্ষেত্রে 'ফ্রি' শব্দটি এই দুটি অর্থই বহন করে। একটি থেকেই আরেকটায় পৌঁছে যাই। জীবন্ত বলেই থিয়েটারের সম্ভাবনা আছে 'মানবিকক্রিয়া' হয়ে ওঠার। দু-দল মানুষ একত্র হলে তাদের মধ্যে কিছু একটা ঘটে—সেটাই মানবিক ক্রিয়া। দুটি দলকে মানবিক স্তরে মিশতে হয় সেই উদ্দেশ্যেই মানবিক ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। আমাদের সমাজের পক্ষে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক হয়ত জরুরি কিন্তু তাকে নিশ্চিতভাবেই মানবিক সম্পর্ক আখ্যা দেওয়া যায় না। এখানে যে সম্পর্কের কথা বলছি তা হল প্রেমিকের, জননী ও শিশুর, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর। অথবা এমনও হতে পারে সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষজন কোনও এক মুহূর্তে পরস্পরের গাঢ় অভিজ্ঞতার ভাগীদার হচ্ছে। শেষোক্ত ধরনটির একটা দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। আমার প্রজন্মের কলকাতাবাসীর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল। যখন হঠাৎ প্রায় যাদুস্পর্শে বছর পুরনো হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সম্পূর্ণ উবে গেল তখন একই উদ্দেশ্যে হিন্দু চাইছে মুসলিমকে আলিঙ্গন করতে।

অর্থাৎ যেমনটি বলছিলাম, নতুন থিয়েটারের ক্ষেত্রে আমরা অনুভব করেছি 'ফ্রি' শব্দটির দুটি অর্থই পরস্পর বিজড়িত হয়ে আছে। আমরা এই জিনিসটা অনুভব করেছি, চেষ্টা করেছি, চর্চা করেছি এবং থিয়েটারে এভাবেই আমাদের যাত্রা শুরু। এখানে আমি সেই অভিযানের কথাই বলতে চাইছি—শুকনো যুক্তি আর তত্ত্বের কথা নয়।

ভাবতে বেশ মজা লাগছে, শুরুতেই গেয়ে রেখেছিলাম অসঙ্গতি বা পারম্পর্যহীনতার কথা। এই অসঙ্গতি বা বে-খেয়ালই বর্তমান রচনাটির ক্ষেত্রে আমি মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছি। আপাতত তার সুযোগে অনেকটা সময় উজিয়ে যাওয়া যাক। ১৯৮৬ সালের ২৯ মার্চ। আমাদের 'গ্রাম পরিক্রমা'র দ্বিতীয় দিন। থিয়েটার এবং গণসঙ্গীতের বিভিন্ন দলের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে থিয়েটার আর গান করাকেই আমরা 'গ্রাম পরিক্রমা' নাম দিয়েছিলাম। এই পরিক্রমার ষষ্ঠ গ্রামটি ছিল সুটিয়া। ভয়ঙ্কর দারিদ্রপীড়িত এক প্রত্যন্ত গ্রাম। মাঝরাতে এখানে আমাদের থিয়েটার আর গানের বৈকালিক অধিবেশন শেষ হয়। সেবারের পরিক্রমায় দলে ছিলাম ৭০ জনেরও বেশি, ৭টি গ্রুপে বিভক্ত। রাতে জনৈক বৃদ্ধ আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চললেন। আমাদের যেখানে থাকা-খাওয়ার কথা চলেছি সেই দিকে। বৃদ্ধ সঙ্গ ছাড়লেন না। চলে এলেন আমাদের সেই রাতের আশ্রয় পর্যন্ত। যদিও তাঁর বাড়িটি ছিল সম্পূর্ণ উল্টোদিকে। 'বৃদ্ধ' বললাম—তাই না? সত্যি তখন তাঁকে দেখে

মনে হচ্ছিল যেন ষাটের ওপর বয়স। কিন্তু পরে আমরা আবিষ্কার করি তাঁর বয়স মাত্র ৪৫। ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুন ওইরকম দেখাচ্ছিল। তিনি ছিলেন ভূমিহীন খেত-মজুর। ভগ্নস্বাস্থের জন্য তাঁর কাজও জুটছিল না। প্রায় কাঙালের মতো অবস্থা। পরের দিন সকালে আমরা রওনা হলাম ১০ কিলোমিটার দূরের গ্রামের দিকে! চৈত্রের প্রখর তাপ। চলেছি ছায়াহীন ধানখেতের রাস্তা ধরে। দেখি সেই ব্যক্তিও আমাদের সঙ্গে চলেছেন। ভাবলাম এখানে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি হয়ত ফিরে যাবেন। কিন্তু সেসবের ধার ধারলেন না, আমাদের সঙ্গেই চললেন তারও পরের গ্রামের দিকে। এভাবে কেবলই নিজের বাড়ি থেকে আরও-আরও দূরে চলে যেতে থাকলেন। একবারের জন্যও ভাবলেন না সন্ধ্যার মধ্যে কীভাবে বাড়ি ফিরবেন। বিশেষ করে নিজেই বলেছিলেন রাতে কিছু দেখতে পান না। এমনকি রাতে বাড়ি ফিরে আসা সম্ভব হবে না জেনেও কী খাবেন, রাতে কোথায় থাকবেন এসবও ভাবেননি। একসময় তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কেন আমাদের সঙ্গে আসছেন, জবাবে তিনি বললেন, 'জানিনা, কেমন যেন নেশা লেগে গেল।'

আমাদের প্রথম পরিক্রমার কথা বললাম। প্রথমবারের অভিজ্ঞতায় আমাদেরও সকলেরই 'নেশা' লেগে গিয়েছিল। আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। তবু এই অভিজ্ঞতায় সমান-ভাবে ভাগ বসাতে কারও কোনও অসুবিধা হয়নি। 'মানবিক'—এই ছিল ভিত্তি। এই ভিত্তি কতখানি গভীর হতে পারে তার দৃষ্টান্তও প্রথম পরিক্রমাতেই দেখেছি। থিয়েটারের পর দর্শকমণ্ডলীর কাছে গামছা পাতা হয়। স্বেচ্ছাদান সংগ্রহ। তো সেখানে নিতান্ত দরিদ্র মলিন বেশে এক বৃদ্ধা ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে গামছা এগিয়ে দেয়নি। অথচ বৃদ্ধা তাঁর পুঁটলি হাতড়ে একটি পাঁচ পয়সা স্বেচ্ছায় দান করেন।

এ কি দর্শকের অংশগ্রহণ নয়? এ কি মানবিক ক্রিয়া নয়? যেভাবে খুশি আপনারা এই ঘটনাটির বিচার করে দেখুন। আমাদের কাছে অবশ্য সেদিন এই ঘটনা উচ্চস্বরে দর্শকের অংশগ্রহণের বার্তাই বয়ে এনেছিল।

থিয়েটারের খোঁজে অভিযান। নতুন থিয়েটারের এই যাত্রায় একেবারে প্রথমদিকে আমি "স্পার্টাকুস" নাটকটি লিখি। প্রসেনিয়ামের বাইরের থিয়েটার-স্থান মাথায় রেখে আমি প্রথম এই নাটকটি রচনা করি। হাওয়ার্ড ফাস্ট তাঁর মহাকাব্যোচিত উপন্যাসে যে বিশাল প্রেক্ষাপট রচনা করছেন, সেই বিরাট কাজটিকে থিয়েটারে নিয়ে আসার সাহস হল যখন থিয়েটারের এই নবতম স্থানের কথা ভাবতে পারলাম। উপন্যাসটির কথা আগেও ভেবেছি। কিন্তু বারবারই তার নাট্যরূপ দিতে গিয়ে পিছিয়ে এসেছি। প্রসেনিয়াম থিয়েটারে এ সম্ভব নয়। সাহস হয়নি।

নাটক লেখা শেষ হল। বেজায় বড় হয়ে গেল "স্পার্টাকুস"। দেখলাম অভিনয়ে কম করে চার ঘণ্টা সময় লাগবে। যদিও গুরুত্বপূর্ণ অনেক উপাখ্যান, চরিত্র বাদসাদ দিয়েই করেছি। ইহুদি গ্লাডিয়েটর ডেভিডের চরিত্র পর্যন্ত বাদ দেওয়ার কথা ভাবতে হল। এত কষ্ট হল কী বলব! রীতিমতো কান্না পেয়ে গেল। তবে সম্পাদনা, অর্থাৎ কিছুটা সার-

সংক্ষেপ করার পথে কেন গেলাম না এই প্রশ্ন উঠতে পারে। তাহলে তো সহজেই নাটকটির দৈর্ঘ্য নিজেদের সুবিধামতো মাপে নিয়ে আসা যেত। এর উত্তরে দুটো কথা বলা যায়। এক, হয়ত মনে হয়েছে আমার সে যোগ্যতা নেই। দুই, দলের উপর আমার আস্থা ছিল। যাইহোক নাটকটি নিয়ে মহড়া শুরু হল।

এবার 'মহড়া' শব্দটি কেটে দিতে চাই। কারণ আমরা সেই প্রথম এমন একভাবে কাজ শুরু করি যাকে 'মহড়া' শব্দে আদৌ বোঝানো যাবে না। বরং ইংরেজি 'ওয়ার্কশপ' শব্দটিই এখানে অনেক বেশি লাগসই। নাটকের প্রস্তুতির ব্যাপারটা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হল। এইভাবে সকলে মিলে চেষ্টা করে নতুন একটা পদ্ধতি বেরিয়ে এল। ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়া। এভাবে যাঁরা কাজ করেননি, ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি, তাঁদের কাছে এ শুধু একটা পরিভাষাই হয়ে থাকবে। সরাসরি অভিজ্ঞতা ছাড়া এ জিনিসটা বোঝা, বোঝানো সম্ভব নয়। ভাষায় 'ওয়ার্কশপ-প্রক্রিয়া' মূর্ত করে তোলা কঠিন। প্রায় অসম্ভব। পশ্চিমের কিছু ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেই এই ধরনের প্রক্রিয়ার কথা প্রথম জানতে পারি। এইসব ব্যক্তিরা হয় থিয়েটার না হলে নাচের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খুব দ্রুত প্রক্রিয়াটিতে নানা বদল ঘটতে থাকে। প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়। প্রথমে আমাদের নিজেদের দলে, পরে থিয়েটার ও তার বাইরের লোকজন নিয়ে ওয়ার্কশপ করার মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়াটি পুষ্ট হয়ে ওঠে।

সেই পাঁচের দশকেই পশ্চিমী রীতির 'প্রোডাকশন নোটস'-এর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। মহড়া শুরু করার আগে নোটস, নক্সা আর মডেলের সাহায্যে কোরিওগ্রাফির পুরো কাজটাই সেরে নিতাম। মঞ্চে তিন-পা পিছিয়ে যাওয়া, ঘোরা, পাঠ বলা, সামনে এগিয়ে গিয়ে তিন নম্বর চেয়ারে বসে পড়া—এই জাতীয় জিনিস আর কি। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও এতে মোটের উপর খুশিই হতেন। কেননা তাঁদের আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না।

আগে থেকে ছকে দেওয়া এই পরিকল্পনা সম্পর্কে একমাত্র তখনই ভাবা হতো যদি কোনও সমস্যা দেখা দিত। যে সমস্যার কথা আগে ভাবিনি। তবে তারও সমাধানের ভার ন্যস্ত হতো আমারই উপর।

কিন্তু "স্পার্টাকুস" নাটকটির প্রস্তুতিপর্বে নির্দেশক হিসাবে আমার ভূমিকা দাঁড়াল একেবারে উল্টোটা। নোটস, নক্সা ডায়গ্রামে আগে থেকে কিছুই ছকে ফেলা হয়নি। মহড়ার সময়ে কোনও একটি দৃশ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও কোরিওগ্রাফির পরামর্শ যখন দিয়েছি তখনও তা পূর্ব পরিকল্পিত নয়। সকলের মতামতের জন্য অপেক্ষা করা হতো, নানা ধরনের অদল-বদলের পরামর্শ, বা অন্য কোনও কোরিওগ্রাফির প্রস্তাবও উঠত। শেষপর্যন্ত কোনটা রাখা হবে তা আর নির্দেশকের উপর নির্ভর করত না। দল যেটা ঠিক করত সেটাই আমরা বেছে নিতাম। নির্দেশকের হস্তক্ষেপ সেইসব অতি-বিরল ক্ষেত্রেই ঘটত যেখানে দলের সবাই কোনওভাবেই একমত হতে পারছে না।

এই পদ্ধতিতে যে কাজ হল তার একমাত্র কারণ, প্রাথমিক অনুশীলন এবং ওয়ার্কশপ

এ-দুটো জিনিস আমরা সবাই নিষ্ঠার সঙ্গে মেনেছিলাম। নাটকটির প্রস্তুতিপর্ব এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল।

থিয়েটারে ভাব প্রকাশের অনুশীলন ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক বাধা হল জড়তা। প্রাথমিক অনুশীলন এই বাধা দূর করে। তা ছাড়া আরও অনেক সুফল তো আছেই। আমরা এভাবে নিজেদের শরীরটাকেও জানতে পারি। শরীরের সুপ্ত শক্তি ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করি। পারস্পরিক আস্থার বিকাশ ঘটে। এই আস্থা দেহ ও মন উভয়েরই। থিয়েটার-স্থান বা 'স্পেস' এবং অন্যান্য অভিনেতা তথা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কটা ধরতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে এবং গোষ্ঠীগতভাবে শব্দ, অঙ্গসঞ্চালন (movement) ও ছন্দের অনুশীলন হয়, প্রত্যেকে নিজেদের সৃজন শক্তি সম্পর্কে সচেতন হন এতে। এ প্রায় এক আবিষ্কার তাঁদের কাছে। ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়া তাঁদের সেই সৃজনী ক্ষমতার উন্মেষ ঘটায়। তাকে রূপ দিতে সাহায্য করে। যৌথতার এক জোরালো বোধ গড়ে ওঠে। এগুলিকে বলা যায় প্রাথমিক স্তরের ওয়ার্কশপ অনুশীলন, এবং এই অনুশীলন চলে বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে। পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীত হয় 'থিম' বা বিষয়বস্তু। এইবার মনের ভূমিকা। বা অন্যভাবে বললে দেহ-মন সম্পর্ক স্থাপন। এখানেই থিয়েটার স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল, সার্কাসের সঙ্গে তার ধর্মের তফাত। ঠিক এইখানটিতে এসে ওয়ার্কশপ-অনুশীলন হয়ে পড়ে 'অন্তর্গত'। এবং এই প্রক্রিয়াতেই বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তি অভিনেতা নিজের অনুভবের সংযোগ ঘটাতে পারে। শরীরে তা বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। শরীর সঞ্চালন, ধ্বনি, ছন্দ, শক্তি (power) এবং উচ্চারণের মাধ্যমে।

নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে যৌথভাবে অভ্যন্তরীণ চর্চার মধ্য দিয়েই যে কোরিওগ্রাফিও সৃষ্টি হয়ে যায় এমন নয়। কিন্তু এতে নাটকের সারবস্তু রক্তে মিশে যেত। শক্তির উন্মেষ ঘটাত। তার গাঢ়তা, মেজাজ, নাট্যকর্মী ও প্রযোজনার মধ্যকার অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের জরুরি ধাঁচ ধরতে সাহায্য করতো। আর তখনই গ্রুপের পক্ষে সম্ভব হত কোরিওগ্রাফিকে চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা। এটা মোটেই ওপর থেকে বা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, দলের এক সামগ্রিক অবদান আছে। সেখান থেকেই উঠে আসছে।

আমি জানি একথাগুলো অস্পষ্ট এবং তাত্ত্বিক শোনাচ্ছে কিন্তু উপায় নেই। এর চেয়ে ভালভাবে আমি বলতে পারব না। এর বেশির ভাগ প্রক্রিয়াই প্রয়োগসঞ্জাত। অর্থাৎ আমরা চর্চার মধ্য দিয়ে দেখেছি প্রক্রিয়াটি কাজ করছে। তবে আমরা হয়ত সঠিকভাবে কিংবা সামগ্রিকভাবে জানিনা কেন ও কীভাবে কাজ করছে।

"স্পার্টাকুস"-এর প্রস্তুতিপর্বে যেমনটি ঘটেছিল : নাটকটির একের পর এক পৃষ্ঠা রূপান্তরিত হচ্ছিল, প্রকাশিত হচ্ছিল ধ্বনি, অঙ্গসঞ্চালন, আর শক্তিতে। দলের কাজের পর রোজ সন্ধেয় আমি নাটকের স্ক্রিপ্টটা নিয়ে বসতাম এবং প্রায়শই দেখতাম নাটকটির ভাববস্তুর বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে বেশ খানিকটা কেটে দেওয়া যায়। এইভাবে স্ক্রিপ্টের আয়তন অনেকটাই ছোট হয়ে গেল।

শহুরে মানুষ হয়ত "স্পার্টাকুস" নাটকটির কাঠামোকে জটিল ও চর্চিত সাহিত্যের অঙ্গ বলবেন।

সেভাবে কোনও ঘটনা পরম্পরা নেই। ঘটনাস্থলও দ্রুত বদলে যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, সময়ের আগুপিছু, এমনকি একই দৃশ্যে স্থানকালের বিভিন্নতা আছে। স্পার্টাকুস ব্যক্তিনায়ক নন, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দাসদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এই নাটকের প্রযোজনায় আমরা কোনও সেট ব্যবহার করিনি। আমাদের অভিনীত নাটকটিতে সারবস্তু অন্তর্লীন হয়েছিল দাসদের রক্ত ও ঘামে, তাদের বিদ্রোহে। ভারবাহী জন্তুর মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রীতদাসরা মরুর উপর দিয়ে বোঝা টেনে চলেছে। আমাদের দলের অভিনেতারা চর্চার মধ্য দিয়ে এটাকে মূর্ত করে তুলেছিল। যেন প্রকৃতই তারা বহন করে চলেছে দুঃসহ বোঝা। নাটকটির প্রস্তুতিতে আমাদের প্রায় একবছর কেটে যায়।

এভাবে খুঁটিয়ে কাজ করার ফলও পেয়েছিলাম হাতেহাতে। নাটকটি নিয়ে প্রথমবার গ্রামে গিয়েই যা সাড়া পেয়েছিলাম তার তুলনা নেই। বেশ বুঝতে পারলাম এ নাটক সমস্ত গ্রামে সমাদৃত হবে। গ্রামের মানুষ যাত্রা আঙ্গিকটির সঙ্গে সুপরিচিত। নটের উচ্চগ্রামের ভাষণে তাঁরা উচ্ছ্বাসে হাততালি দিতে অভ্যস্থ। আমাদের নাটক "স্পার্টাকুস"-এ দাস বিদ্রোহের মুহূর্তগুলিতে ভাষণের কোনও ব্যাপারই নেই, শুধু শব্দ আর অঙ্গসঞ্চালনেই শেখানে শক্তির এক বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু গ্রামবাসীদের চিনতে ভুল হয়নি। তাঁরা ঠিক ওই জায়গাটিতেই হাততালি দিয়ে ওঠেন। গ্রামে "স্পার্টাকুস"-এর প্রতিটি অভিনয়েই এটা ঘটেছে ব্যতিক্রমহীনভাবে। এই হাততালি মধ্যবিত্ত প্রধান শহরের অভিনয়ে কিন্তু একবারও ঘটেনি। এথেকে একটা জিনিসই বোঝা যায় দাসদের কষ্ট আর বেদনা (সহ্যের) সীমা লঙ্ঘন করেছে। গ্রামবাসীরা একান্তভাবে চাইছে দাসরা বিদ্রোহ করুক এখনই, এই মুহূর্তে।

আমার নাটক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শহুরে লোকরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ মশাই সাধারণ লোক আপনার নাটক বোঝে' ? প্রথম-প্রথম আমি উত্তরটা এভাবে এড়িয়ে যেতাম : 'কই, ওঁরা তো উঠে চলে যান না। সেইটেই আমার কাছে যথেষ্ট।'

শুধু "স্পার্টাকুস" নয় অন্যান্য অনেক নাটকের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি শহুরে শিক্ষিত লোকজনের থেকে নিরক্ষর মানুষজন নাটকের ভাববস্তু অনেক ভাল বুঝতে পারেন। শহুরে, শিক্ষিত লোকজন নাটকের আঙ্গিকের প্রশংসা করেন। উপস্থাপনার কায়দা-কানুন ইত্যাদি প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হন। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তুর (কনটেন্ট) কথা উল্লেখও করেন না। আমাদের ক্ষেত্রে যদিও কনটেন্টই শুরুর পয়েন্ট। সেখান থেকেই যাত্রা শুরু। সে প্রসঙ্গ আলাদা।

আমাদের এই নতুন থিয়েটার-স্থান, যাকে আমরা 'অঙ্গনমঞ্চ' বলে থাকি সেখানে স্পার্টাকুসই প্রথম প্রযোজনা নয়। যদিও অঙ্গনমঞ্চ মাথায় রেখেই "স্পার্টাকুস" নাটকটি লেখা হয়। এর আগে "সাগিনা মাহাতো", "এবং ইন্দ্রজিৎ" এই দুটি নাটক আমরা অঙ্গনমঞ্চে করেছি। ইফলে মাত্র একবারই আমরা মঞ্চে "এবং ইন্দ্রজিৎ" করেছিলাম।

ফলে তুলনা করতেও খুব সুবিধে হয়েছিল। অঙ্গনমঞ্চের ক্ষেত্রে লেখক দর্শকদের মধ্য থেকে চরিত্রদের ডেকে নেন, অভিনেতারা বসে থাকেন দর্শকদের মধ্যেই। ফলে লেখকের চোখ যখন দর্শকদের মধ্যে চরিত্রদের খোঁজে দর্শকরা চেষ্টা করেন লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে। যদিও তাঁরা জানেন অভিনেতারা দর্শকদের মধ্যেই মিশে আছেন। "এবং ইন্দ্রজিৎ" নাটক মঞ্চে অভিনয় করে এই এফেক্ট পাওয়া যায়নি, সেখানে দেরি করে আসা দর্শককে ডেকে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পন্থা নেই। দর্শক ও অভিনেতার মাঝখানের পাঁচিল ভেঙে ফেলার ফলেই অঙ্গনমঞ্চে এই অধিকতর কার্যকর পন্থা কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছিল।

দুই ॥

মুক্ত থিয়েটারের শক্তি ও সম্ভাবনা যতই উপলব্ধি করতে থাকলাম আমাদের কাজের ধরনও ততই বদলে যেতে থাকল। থিয়েটারকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে হবে ; যেখানে জনসাধারণ সেখানেই এই থিয়েটার—এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে উঠল। দলের দার্শনিক ভিত্তি হয়ে উঠল অনেক সুস্পষ্ট। কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুই আমাদের নাটকের গোড়ার কথা। কীভাবে এই বিষয়বস্তুকে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে, সবচেয়ে গভীরভাবে প্রকাশ করা যায় সেই আঙ্গিকের জন্য মাথা ঘামাতে লাগলাম।

অগ্রাধিকারের ব্যাপারটা এরকম হলেও ফর্ম কখনও কখনও বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করতে পারে। কনটেন্ট যে তখন ফর্মের বশীভূত ঠিক একথা বলছি না। তবে ফর্মের প্রভাবে কনটেন্ট হয়ত আরও সুসঙ্গত, ভিন্ন এক গঠন পেল, প্রকৃত নাটক হয়ে উঠল। একটি নাটকের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে আমি নাটকটি লিখি। ওই বছরই নভেম্বর মাসে এক গ্রামে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। ১৯৯২ সালের ৬ মার্চ সেই নাটকটির দুশোতম অভিনয় হয়ে গেল কলকাতার কাছাকাছি এক গঞ্জে।

কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বরাবরই ভালবাসার এবং ঘৃণার। সাতের দশকের শুরুতে কলকাতার উপর কোলাজের ফর্মে একখানা নাটক করার কথা ভেবেছিলাম। কলকাতাকে সবাই মিছিলের শহর বলেই জানেন। তাই মনে হল মিছিল নামটাই যথাযোগ্য হবে। তাছাড়া, শুধু নাম নয়, কলকাতাকে মূর্ত করে তোলার পক্ষে এই মিছিলের পথ-ই মানায়। সাতের দশকের সেই বছরগুলিতে অজস্র যুবক-কিশোর পুলিশের হাতে খুন হল। নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করা হল প্রকাশ্যে, গোপনে। একটাই স্থায়ী চিত্রকল্প তখন আমি দেখতে পেতাম, রোজই একজন খুন হচ্ছেন। এবং আরেকটি চিত্রকল্প হল ভাঁড় গোছের এক বৃদ্ধ। অন্তত আমার মনে এরকমই একটা অস্পষ্ট ছবি গেঁথে যায়। সম্ভবত নিজেকেই আমি ওই চরিত্রে দেখতে পেতাম। শিথিল কিছু নোট রেখেছিলাম, অসংলগ্ন কিছু দৃশ্যের নোটও। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট আকার গড়ে উঠেনি, কোনও দিকদিশাও ছিল না।

আকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর তিন তলায় তখন আমাদের অঙ্গনমঞ্চটি ছিল

অর্থাৎ একটি ঘর নিজেদের গুটিকয় বেঞ্চ, টুল ইত্যাদি। এক বিকেলে আমি সেই ঘরে একা আছি। হঠাৎ বেঞ্চগুলো নানাভাবে সাজাতে শুরু করি। এলোমেলো করে রাখি। এভাবে গোলকধাঁধার মতো একটা পথ তৈরি হয়ে যায়। বেজায় খাটনিতে ক্লান্ত, কিন্তু নানারকম দৃশ্য দেখতে লাগলাম। জটিল রাস্তার নক্সা দেখতে দেখতে মনে হল বিচিত্র পথ, কাল্পনিক মিছিল এঁকে-বেঁকে ছুটে যেতে চাইছে ওইসব রাস্তা ধরে। আর দুপাশে রয়েছে কাল্পনিক দর্শককুল। যুবকটি খুন হয়ে চলেছে। আর বৃদ্ধ এই রাস্তার জটিলতায় পথ হারিয়ে ফেলেছে। বস তথা গুরু এবং কোটাল ধীরে ধীরে অবয়ব নিতে থাকে। আগেকার নোট ও রচিত দৃশ্যগুলোতে মিছিলের কোরাস ছিলই। বেঞ্চের পর বেঞ্চ সাজিয়ে গড়ে তোলা গোলকধাঁধাঁ রাস্তা নিজের চোখে দেখা মাত্র নাটকটির পরিণত রূপ আমার কাছে ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে যায়।

সাঁওতাল গ্রাম কাপাসটিকুরি গ্রামোন্নয়ন সংস্থার সম্মেলন উপলক্ষে নাটক করার ডাক পেয়েছি। আমরা "মিছিল" নাটকটাই করব। অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটুকুকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আছেন প্রায় তিনশো মানুষ। এঁদের মধ্যে আড়াইশোই সাঁওতাল। খালি গা, খালি পা। সাঁওতালরা বাংলা জানেন এই যা।

আমরা একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। এই নাটকে গল্প বলে কিছু নেই। চরিত্র নেই। শহরের নানা চিত্রকল্পে ঠাসা নাটক। হঠাৎই মনে হল, কিন্তু এঁরা বুঝতে পারবেন না, এই নাটকে এমন কিছু তো নেই। বরং উল্টোটাই সত্যি, এরাই অনায়াসে বুঝে যাবেন। প্রতিদিন এক যুবকের নিহত হওয়ার ঘটনা এঁদের জীবনে তো এক মূর্ত অভিজ্ঞতা। বৃদ্ধ তাঁর পুরনো ঘরে ফিরতে চান না, পুরনো বাড়ি যে এক্ষেত্রে বর্তমান সমাজ সে কথা এঁদের বলে দিতে হবে না। এবং নতুন ঘরের খোঁজ যে আসলে অন্যায়, অবিচার, অনাহারের শেষ, নতুন ঘর মানে যে ন্যায়বিচার—একথা এঁরা সহজেই বুঝবেন। নাটক শুরুর আগে আমি মিনিট তিনেক সময় নিয়ে একথাগুলো বলি।

এরপর নিশ্ছিদ্র নীরবতা। একঘণ্টার নাটক। এই একঘণ্টা সবাই একাগ্রচিত্তে নাটক দেখেছেন। নাটকের শেষে আমরা হাত ধরাধরি করে একটা সুরে গেয়ে উঠি কিন্তু সেই গানে একটিও কথা থাকে না। দর্শকদের আমন্ত্রণ জানাই আমাদের সঙ্গে এসে হাত মেলাতে। এক বৃদ্ধ সাঁওতাল অশ্রুসজল চোখে এগিয়ে এনেন, একজন অভিনেতাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই বৃদ্ধ সাঁওতাল, পথের সঙ্গী সুটিয়া গ্রামের সেই 'বৃদ্ধা', পাঁচ পয়সা দান করেছিলেন যে ভিখারিনী, রাঙাবেলিয়া গ্রামে মাটি খোঁড়া সেই মজুর—এঁদের কথাই আমরা মনে করি যখন হতাশা আর ক্লান্তি আমাদের আচ্ছন্ন করতে চায়।

রাঙাবেলিয়া গ্রামের সেই মজুরটি পুকুর কেটে চলেছেন। বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীর জল বড়ই নোনা। নোনা জল চাষে লাগে না। সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিল করে বসত গড়েছিলেন যে আদিবাসী মানুষজন এই দিন-মজুরটি তাঁদের বংশধর। বাঘ, সাপ, কুমিরের সঙ্গে লড়ে নোনা জলে তে'তুল মিশিয়ে

খেয়ে যে জমি তাঁরা হাসিল করেছেন, পরে দেখেছেন সেই জমি তাঁদের নয়। শহুরে মানুষের। কী একটা কাগজের জোরে জমির মালিক শহুরেবাবু। মাটি কাটা দিন মজুরিটি এই বঞ্চিত আদিবাসী 'ভোমা'র বংশধর।

সকালবেলা। সুন্দরবন এলাকায় পুকুর কাটার কাজে ব্যস্ত দিনমজুরদের কাছে গেলাম আমরা। আগের দিন সন্ধেয় এখানে "ভোমা" নাটকটা করেছি। মজুররা সব কাজ থামিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। কাজ থামানোর অর্থ রোজগার বন্ধ। কারণ এঁদের ফুরনের কাজ। কাজ করলে তবেই পয়সা। স্থানীয় এক সমাজকর্মী জানতে চায় গতকালের নাটকটা তারা বুঝেছে কি না।

নাটকে গল্প নেই, সাজ-পোশাক নেই, গান নেই, ভাল লাগে এমন কিছু নেই। এইসব বলে তিনি খোঁচাতে লাগলেন। কিন্তু সে দিনমজুরটি এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, তারপর খুব শান্তভাবে বললেন, 'এই নাটকে এমন একটা কথা নেই যা আমাদের মতো গরিব মানুষের বুঝতে কষ্ট হয়, তবে হ্যাঁ বড়লোকরা না-ই বুঝতে পারে।'

ঠিক এইরকমই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল অনেক পরে এক গ্রামে যেখানে এক বৃদ্ধ মুসলমান দর্শক ভোমা নাটকটি আমাকেই বোঝাতে শুরু করেন! "ভোমা" নাটকটি বহু স্বতন্ত্র দৃশ্যের সমাহার। দৃশ্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আমার লিখতে সময় লেগেছিল প্রায় তিনবছর। কোনও ঘটনা, অভিজ্ঞতা তা সে বাস্তব জীবনের হোক কিংবা বই, সংবাদপত্র, বা আলোচনাতেই ঘটে থাকুক—যেটাই আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে তা থেকেই এ নাটকের বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলি গড়ে ওঠে। বলতে গেলে কোনও সংলাপই নেই নাটকটিতে। যা আছে তাকে বক্তব্য, ভাষণ বলা যেতে পারে। এই বক্তব্য বা ভাষণের প্রত্যক্ষ শ্রোতা হলেন দর্শক। দৃশ্যগুলি রচনার সময় আমার একবারের জন্যও মনে হয়নি নাটক লিখছি। বরং আমি যেন একটা দিনলিপি বা ডায়েরি লিখে যাচ্ছিলাম। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিক, আমরা তখন নতুন নাটক খুঁজছি। সেইসময় একদিন গ্রুপে এই দৃশ্যগুলি পড়ে শোনালাম। গ্রুপের সবাইকে বলা হল এ সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি লিখতে। আমি যে দৃশ্যগুলো রচনা করেছিলাম সবাই মিলে তার উপর কাজ শুরু করল। অনেকের অবদানে ক্রমে গড়ে উঠল "ভোমা" নাটকটি।

আদতে নাটকটিতে ভোমা প্রসঙ্গ ছিল একটিমাত্র দৃশ্যে। রাঙাবেলিয়া স্কুলের হেডমাস্টারের মুখে আমি গল্পটা শুনি। ওঁর সঙ্গে ভোমার দেখা হয়েছিল। তখন ভোমার বয়স ৭২ বছর। একবার বাঘের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল ভোমাকে। সেই জীবন-মরণ লড়াইয়ে ভোমা একটি চোখ এবং ডান গালের এক খাবলা মাংস হারায়। নাটকটিতে ভোমা রুমশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনকি নাটকটি তার নামে নামাঙ্কিত হয়ে যায়। যদিও নাটকে কখনওই সে সশরীরে একটি চরিত্র হিসাবে উপস্থিত নয়। আবার এই নাটক ভোমার জীবনকাহিনীও নয়। ভোমা নয়, নাটকটি ভোমাদের কথা বলে। অর্থাৎ তা হয়ে ওঠে সমাজ বাস্তবতা। কী না এসেছে সেখানে, ভূগর্ভের

জলসমস্যা, পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার বিপদ, কলকাতার পাতাল রেল প্রকল্প, ডলার সাহায্য ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইসব বিক্ষিপ্ত ও বিচিত্র সমস্যার মধ্যে সূত্র একটাই : একজন শহুরে মানুষ ভোমাকে খুঁজে চলেছেন। কারণ ভোমাই একমাত্র ব্যক্তি যে বিষাক্ত জঙ্গল হাসিল করে আবাদ বানাতে পারে। বর্তমান সমাজই সেই বিষগাছের ঝাড়। ভোমাই পারে তা নির্মূল করে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলতে।

নাটকটির উপস্থাপনায় আমরা মাত্র ছ-জন অভিনেতাকে কাজে লাগাই। চার-পাঁচ জনের একটা বসে-থাকা কোরাস শব্দ ও সুরে সাহায্য করে। ভোমা আমাদের দলের সেই গুটিকয় নাটকের একটি যাতে শুরু থেকেই অভিনেতারা টান টান থাকেন, একাত্ম হয়ে পড়েন। ফলে প্রতিবারের অভিনয়েই তাঁদের মনে হতো, এই যেন প্রথমবার নাটকটি করছেন। নাটকটি তৈরি করতে আমাদের একবছর সময় লেগেছিল। ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নাটকটি গড়ে তোলা হয়। রাঙাবেলিয়াতেই নাটকটি প্রথম অভিনয় করি একথা ভাবলে বেশ গর্ব হয়। কারণ সেটাই ভোমার গ্রাম। এ পর্যন্ত ১০৪ বার আমরা "ভোমা" করেছি।

"ভাঙা মানুষ" নাটকটির ক্ষেত্রেই আমরা সব থেকে বেশি একাত্ম হয়ে যাই। এতখানি সম্পৃক্তির অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। ১৯৭৭ সালের ঘটনা। তখন অনাহার, অর্থ, বন্দিত্ব, পীড়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ওয়ার্কশপ করে চলেছি। প্রপস হিসেবে ব্যবহার করছি দড়ি, মুদ্রা, বাসি রুটি ইত্যাদি। ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এমন একটি এনার্জি সঞ্চারিত হল যে আমরা ভাবলাম আর এক ধাপ এগিয়ে কাজ করব, চেষ্টা করব ওয়ার্কশপকেই সরাসরি থিয়েটারে নিয়ে আসতে। অনেক আলোচনা, বিতর্ক এবং বহু ওয়ার্কশপের পর আমরা সাহসে ভর করে এগোলাম। কিন্তু নাটকটির উপস্থাপনার সময় আমরা মধ্যে-মধ্যে নিরাপত্তার অভাব বোধ করতাম, কোনও দর্শকের ঠোঁটে সিনিক-হাসি দেখলে অত্যন্ত আঘাত পেতাম। ৯ বার অনুষ্ঠানের পর এই নাটকটা আমরা আর করতেই পারলাম না। ভাঙা মানুষের পুরো বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই এটুকু বলেই থামতে হচ্ছে। এর চার বছর পরে এই একই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সুগঠিত কাঠামোয় আমরা "মানুষে মানুষে" করি। "ভাঙা মানুষ" করে যে গভীর অভিজ্ঞতা হয়েছিল এক্ষেত্রে তার ধারে-কাছে পৌঁছতে পারিনি। তবে আমাদের থিয়েটারে "মানুষে মানুষে"-ই একমাত্র প্রযোজনা যেখানে কথার ব্যবহার বলতে গেলে নেই। বাংলার বাইরে তাই এর প্রযোজনা সহজে করা গেছে। আকাডেমির ঘর ছেড়ে দিলাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে। শুধু মাঠে-ঘাটেই চলতে থাকল আমাদের অভিনয়। কিন্তু এমার্জেন্সির সময় মাঠের অভিনয় পুলিশ বন্ধ করে দিল। তখন ঘর খুঁজতে বাধ্য হলাম, প্রায় আন্ডারগ্রাউন্ড অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার জন্য। এইসময় কলেজ স্কোয়ারে থিয়োসফিকাল সোসাইটির ঘরে প্রতি শুক্রবার অভিনয় চালু হল। এমার্জেন্সি উঠে গেলে আবার কার্জনপার্কে আমরা অভিনয় শুরু করি।

এবার "গন্ডী"র কথায় আসি। ব্রেখটের "ককেশিয়ান চক সার্কল" অবলম্বনে গন্ডী

নাটকটি গড়ে ওঠে। আমরা যে বিশেষভাবে ব্রেখটেরই একটা নাটক করতে চাইছিলাম তা নয়। মনে হয়েছিল ব্রেখটের এই নাটকটি খুবই ভারতীয় এবং সাম্প্রতিক। সে-জন্যই এই নাটকটি বেছে নিই। ব্রেখটের প্রোলগ অংশ পুরোটা বাদ দিলাম একই কারণে। যে-যে অংশ মনে হয়েছে অ-ভারতীয়, ব্রেখট থেকে নির্দ্বিধায় সেসব অংশ বাদ দেওয়া হল। নাটকটির উপস্থাপনা সংক্রান্ত ব্রেখটের যে নির্দেশ আছে আমরা সেসব আদৌ মানিনি। কেননা তাহলে ভারতীয় মেজাজ সৃষ্টি করা যাবে না। একদল লোক বসে গাইছে—এ জিনিসটা আমরা রাখিনি। এমনকি গানই রাখিনি। গানের কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুর খারাপ হলে লোকে শুনবে না। সুর ভাল হলে গানের কথার দিকে মন যাবে না। তাই আমরা ঝুঁকি নইনি। মোট ৮৫ বার নাটকটি আমরা করি। একবারও মনে হয়নি পরিবর্তন সংক্রান্ত আমাদের সিদ্ধান্তগুলি ভুল হয়েছে।

নাটকে শিশুটিকে কীভাবে দেখাবো এ নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তবে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত ছিলাম—শিশুটির জায়গায় পুতুল ব্যবহার করব না। জীর্ণ সেতুটি কীভাবে তৈরি করা হবে, পার্বত্য-পথে সফরের ব্যাপারটা কীভাবে দেখাব কিংবা মাত্র ষোলো জন সদস্য নিয়ে নাটকটা করব কী করে—এসব সমস্যাকে আমরা পাত্তা দিইনি। সদস্যসংখ্যার কথাটা উঠেছে এইজন্য যে আমাদের নাটকে দলের সদস্যরাই নিজেদের শরীর দিয়ে গড়ে তুলবে মঞ্চসজ্জা। আসলে দলের উপর, ওয়ার্কশপ প্রক্রিয়ার উপর আমার গভীর আস্থা ছিল। ইতিপূর্বে "হট্টমেলার ওপারে" তে মানব-দেহের সাহায্যে আমরা সেট তৈরি করেছি, সেই অভিজ্ঞতার পুঁজিও ছিল।

দর্শকের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শূন্য শিশুর জামাটি ব্যবহার করি। অভিজ্ঞতা বলে দিল, দর্শকরা যে নিজেদের কল্পনাশক্তি কাজে লাগাতে উন্মুখ এবং সেই সুযোগ পেয়ে তাঁরা বেজায় খুশি। সেটের সমস্ত কাজ মানবদেহ দিয়ে সম্পন্ন করেছি এমনকি সেই জীর্ণ সেতুটিও গড়ে ওঠে শরীর বিন্যাসে। জীর্ণ সেতুটি পার হওয়া কঠিন। নাটকে এমনভাবেই সেতুটি গড়ে তুলি যে চরিত্রটিকে তা পার হতে সত্যিকারের বেগ পেতে হয়েছিল। অভিনেত্রীর পার হওয়ার সময় সেতুটি রীতিমতো দুলে ওঠে। এবার মহিলা সেতুর রেলিং ধরে সোজা রাখতে চায় নিজেকে কিন্তু লম্বঝর সেতুটির রেলিং হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকা অভিনেতারাও দুলে ওঠেন, যেন যে কোনও মুহূর্তে সেতুটি ভেঙে পড়বে। সেতু পেরনোর সময় অভিনেত্রীকে অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রতিটি পা ফেলতে হচ্ছে যাতে কারও চোট না লাগে। আর তাতেই এমন একটা এফেক্ট তৈরি হয়ে যায় যেন সে সত্যিই একটা পাটাতনের পর ফাঁক পেরিয়ে আরেকটা পাটাতনে পা ফেলছে। খুব সহজ সরল ব্যাপার। কিন্তু এতেই দারুণ কাজ হয়েছিল। এই অভিনেতারাই অবস্থান ও ভঙ্গি বদলে রচনা করেন পার্বত্যপথ। এই পরিবর্তন ঘটাতে কঠোর মেহনত করাতে হয়েছে। গভীর মনোযোগ ও শ্রমেই পরপর এইভাবে সেই বদলে ফেলার কাজটা অভিনেতারা রপ্ত করে নিতে পেরেছিলেন। এবং এমনভাবে বদলটা ঘটানো হতো যেন কোথাও সামান্য

খিঁচ না থাকে। সংখ্যাগত যে সমস্যা ছিল সেটা মেটাতে আমাদের একেকজনকে অনেক ভূমিকায় নামতে হয়েছে। এমনকি একজনকে হয়ত বারো-চোদ্দটি ভূমিকা নিতে হয়েছে। আমরা পোশাকের বদলে পোশাকের আভাস ব্যবহার করেছি, এমনভাবে যাতে চটপট খোলা ও পরা যায়। এই বদলে দর্শকও দ্রুত বুঝে যাবেন সেই মুহূর্তে অভিনেতা অভিনেত্রী কোন ভূমিকাটি করছেন।

দর্শকের প্রতিক্রিয়ার নিরিখে "গণ্ডী" আমাদের সবচেয়ে সফল নাটকগুলির অন্যতম। "স্পার্টাকুস" ও "মিছিল" এর সমপর্যায় ভুক্ত। থিওসফিকাল সোসাইটি হলে "গণ্ডী"-র প্রতিটি প্রদর্শনী অগ্নিগম হাউসফুল হয়ে যেত। গ্রামেও এই নাটক প্রবল সাড়া ফেলেছিল। বিশেষ করে রাঙাবেলিয়ায়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের কাছে নাটকটির বার্তাও সহজেই পৌঁছে গিয়েছিল :

যে মা ভালবাসে তার কাছে যাবে ছেলে
যে গাড়োয়ান গাড়ি চালায় তার কাছে যাবে গাড়ি
যে চাষি চাষ করে তার কাছে যাবে জমি।

নাটকটি ভারতীয় এবং সাম্প্রতিক—আমার এই ধারণা সত্য প্রমাণিত হল। যদি আমরা নাটকটা করে যেতে পারতাম তাহলে "মিছিল"-এর মতো দুশো বারের বেশিও অভিনীত হতো এই নাটক। "স্পার্টাকুস" সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। যদিও ৮৮ বার প্রদর্শনীর পর আমরা আর "স্পার্টাকুস" করতে পারিনি। অন্যদল অবশ্য এখন "স্পার্টাকুস" করে যাচ্ছে।

তিন ॥

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, মঞ্চের জন্য লেখা সমস্ত নাটকই কি অঙ্গনমঞ্চে করা যায়। এ ব্যাপারে আমার জবাব : হ্যাঁ, করা যায়। যদি না নাটকটি করতে হাজারো মঞ্চসজ্জা আর ম্যাজিক অপরিহার্য হয়। যে কোনও নাটক অঙ্গনমঞ্চে করা সম্ভব এই কথা প্রমাণ করতে আমাদের দল ব্যস্ত হয়ে পড়েনি। আসলে এই নতুন থিয়েটার তো আমাদের কাছে নিছক **ফর্মের** ব্যাপার নয়। এ একটা **দর্শন**। যেজন্য আমাদের যাত্রা শুরু হতো বিষয়বস্তু থেকে। কীভাবে বলতে চাই তা নয়। আমাদের কাছে প্রশ্নটা ছিল এইরকম : আমাদের কী বলার আছে। এখান থেকেই আমরা শুরু করতাম।

নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধানে আমরা সাহিত্যের দিকে হাত বাড়ালাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসের প্রতি বিশেষ টান অনুভব করলাম। এত ভাল উপন্যাস আমি খুব কমই পড়েছি। "পদ্মানদীর মাঝি" এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু আমাদের কাজের ধরনের সঙ্গেও খাপ খেয়ে যায়। এখানে গ্রামের শ্রেণীবিন্যাস যেরকম সূক্ষ্ম ও শৈল্পিকভাবে করা হয়েছে তা প্রায় নজিরবিহীন। কিন্তু আমি উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিতে চাইনি। চাইছিলাম উপন্যাসটিকেই সরাসরি থিয়েটারে উপস্থিত করতে। সেজন্যই চরিত্রদের মুখের কথা শুধু নয়, লেখকের বর্ণনা, মন্তব্য—সবই থাকবে। স্ক্রিপ্ট তৈরি

করলাম সেভাবে। কাজ শুরু হল। একবার নয় পরপর দুবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুবারই তা ভেস্তে গেল বাহ্য কারণে। এরপর একই ধরনের একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করলাম। এবারের লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসটির নাম "নাগিণী কন্যার কাহিনী"। আমরা অবশ্য শুধু "নাগিণীকন্যা" নাম দিলাম। এই উপন্যাসে পুরাণ কথা আর বাস্তবের এক চমৎকার মিশ্রণ ঘটেছে। সাপুড়ে সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা ও আবেগের সঙ্গে মনসা এবং চাঁদ সওদাগরের কাহিনীকে লেখক অতি নিপুণভাবে জুড়ে দিতে পেরেছিলেন। আবার সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সাপুড়ে জীবনে যে ভাঙন ও সংঘর্ষ দেখা দিচ্ছে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে লেখক সেই চিত্রটিও তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান দাবি পরিবেশ হিসাবে 'হিজল বিল'-এর উপস্থিতি। গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত একটা জলাভূমি। এই জলায় উপজাতির লোকজন মরশুমে এসে বসত গড়েন। গল্পের আর সব দাবির মধ্যে আছে চিতা, শিকার, নৌকায় এবং পায়ে হেঁটে দীর্ঘ যাত্রা। অর্থাৎ আমাদের বিস্তর জায়গা দরকার। অথচ আমাদের এতখানি জায়গা নেই। দর্শকদের পিছনে দু-পাশে লম্বা ফালি জায়গা মধ্যবর্তী 'এরেনা'-র সঙ্গে যুক্ত করে আমরা স্থান সমস্যার সমাধান করলাম।

কিছু অভিনেতা দর্শকের পিছনে থেকে হিজল বিলের পরিবেশ সৃষ্টি করবে ঠিক হল। দীর্ঘ যাত্রা এবং শিকারের দৃশ্যেও গলি দুটিকে কাজে লাগানো হল। তথাকথিত আলোক সম্পাতের মধ্যে না গিয়েও বা আলোর বিশেষ কারিগরি ব্যবহার না করে শুধু একেকবার একেক জায়গায় আলো ফেলে উপযুক্ত 'জেনাল এফেক্ট' তৈরি করা গিয়েছিল। এর একটাই সীমাবদ্ধতা ছিল, অঙ্গনমঞ্চ ছাড়া নাটকটি করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ শ খানেক দর্শকের মধ্যে আটকে থাকতে হচ্ছে। আরও বেশি সংখ্যক দর্শকের জন্য খোলা মাঠে যাতে নাটকটি করা যায় সেজন্য আমরা ভিন্ন এক কোরিওগ্রাফির কথাও ভাবছিলাম। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। এমন কিছু সমস্যা দেখা দিল যে বার পনেরো করার পর নাটকটা বন্ধ করে দিতে হল।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ "নাগিণী কন্যা"-র প্রায় সাত-আট বছর পরে আমরা "পদ্মানদীর মাঝি" নিয়ে ফের পড়লাম। এই নিয়ে তিনবার চেষ্টা হল। তবে তৃতীয়বারের চেষ্টায় নাটকটা করা গেল। "নাগিণীকন্যা"-র মতো একইভাবে এই নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা হলেও, এর উপস্থাপনা ছিল একেবারেই আলাদা। এ একেবারে নতুন যাত্রা। নাগিণীকন্যায় অনেকেই দুটো চরিত্রে অভিনয় করেছে তথাপি এক-একটি ভূমিকায় একেকজনই ছিলেন। কিন্তু "পদ্মানদীর মাঝি"তে প্রতিটি চরিত্রের দায়িত্ব পালাক্রমে সকলকে নিতে হয়েছে। সেদিক থেকে এ শুধু উপন্যাসের নাট্যরূপ নয়, বরং উপন্যাসটির থিয়েটারি উপস্থাপনা। "পদ্মা নদীর মাঝি" যখন যেখানে খুশি অভিনয় করা সম্ভব ছিল। খোলা মাঠে কিংবা বদ্ধ ঘরে। দুঃখের কথা, মাত্র তিনবার করার পরই নাটকটি বন্ধ করে দিতে হল। আর তার কারণ, যেমনটি বলা হয়ে থাকে 'অনিবার্য কারণে'। তবে আমাদের বিশ্বাস, দল বেঁচে থাকলে এই নাটকটা আমরা

আবার করব।

উপন্যাস থেকে কবিতার প্রসঙ্গে এসে এলোমেলো এই লেখাটির আপাতত সমাপ্তি টানা যেতে পারে। উপন্যাস ও ছোটগল্পের থিয়েটারি উপস্থাপনা থেকে কবিতার মন্তাজ। কবিতা-মন্তাজ বস্তুটি যে কী আমাদের মধ্যে কেউই শুরুতে তা জানতাম না। কারণ এমন তো নয় যে প্রথমে আমরা একটি কবিতা উপস্থাপনার কথা ভাবি ও তারপর এর সঙ্গে খাপ খায় এমন কবিতার কথা ভেবেছি। কিছু কবিতা পড়ে আমরা আলোড়িত হই। তীব্র ইচ্ছে হয় সেইসব কবিতার থিয়েটারি উপস্থাপনার। এখন কবিতা-মন্তাজ এই টার্মটা আমাদের বেশ লাগসই মনে হয়েছিল। সত্যিসত্যি এর মানে কী হতে পারে না পারে সেসব নিয়ে আমরা বিশেষ মাথা ঘামাইনি। যে কবিতাগুলি আমাদের আলোড়িত করেছিল তার রচয়িতা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মণিভূষণ ভট্টাচার্য। এক্ষেত্রে কবিতার চূড়ান্ত নির্বাচন এবং পরম্পরা নিয়ে আমরা গোড়ায় মাথা ঘামাইনি। কবিতা আমাদের রক্তে, ধমণীতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছিলাম। সেইভাবেই ওয়ার্কশপ করা হয়। ধ্বনি ও শরীরের ভাষায় যাতে সেই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি মূর্ত হয়ে ওঠে সেই কাজে আমরা মগ্ন হয়ে পড়ি। থিয়েটারের খোঁজে আরও বহু যাত্রার কথাই বলা হল না, সময় সুযোগ এলে পরে চেষ্টা করা যাবে। □